গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ১ - ৭ নভেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শ্রমজীবী জনতার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক লেনিন

দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৭-র ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। দুনিয়ার প্রথম সফল সেই শ্রমিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে গণদাবীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

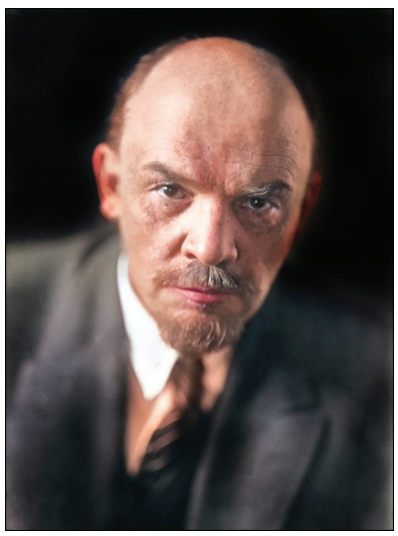

উনিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ায় একদিকে জারের সরকার, তার শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, অভিজাত সম্প্রদায় ও লক্ষ লক্ষ পদদলিত কৃষক, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান শিল্প বাণিজ্যের প্রসার। এ রকম আর্থ-সামাজিক অবস্থাতেই জারের বিরুদ্ধে রুশ দেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার সূত্রপাত। রাশিয়ায় পশ্চিম ইউরোপ ফেরত রুশ সেনা বাহিনীর একদল অফিসার যাঁরা ফরাসি বিপ্লবের ভাবনা-ধারণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁদের নিয়েই প্রথমে রুশ দেশে গোপন বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। ১৮২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর এমনি একদল অফিসার রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ওই দলকেই বলা হয় ডিসেম্বরিস্ট। এর পরই জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সেন্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো প্রভৃতি বড় শহরে গড়ে উঠল গোপন বিপ্লবী চক্র। ১৮৭৬ সালে মাইকেল বাকুনিনের প্রভাবে গড়ে উঠল বিপ্লবী সমিতি।

গুপ্ত সমিতিগুলোর ধারাবাহিকতাতেই নারদনিক বা জনতাপন্থীদের আবির্ভাব

রুশ দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এই গুপ্ত সমিতিগুলোর ধারাবাহিকতাতেই নারদনিক বা জনতাপন্থীদের আবির্ভাব। প্রথম দিকে প্লেখানভও ছিলেন একজন নারদনিক। পরে বিদেশে গিয়ে মার্ক্সবাদের সংস্পর্শে এসে তিনি নারদবাদের বিরোধিতা করেন। তবে মার্ক্সের শিক্ষাকে যথার্থ উপলব্ধি করে নারদবাদের বিরুদ্ধে শেষ সফল আঘাতটি করেছিলেন লেনিন। সেই সময় নারদনিকদের উপর জারের পুলিশের চরম অত্যাচার নেমে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অভয়ার ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ জুনিয়র ডাক্তারদের

অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেওয়া, মেডিকেল কলেজ সহ সর্বত্র থ্রেট কালচারের অবসানের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্বিতীয় কোনও অভয়ার ঘটনা যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট (ডব্লিউবিজেডিএফ) অনশনমঞ্চ থেকে গণকনভেনশনের আহ্বান জানিয়েছিল।

'আমার বোনের বিচার চাই, শেষ না দেখে আমরা থামবো না'— ২৬ অক্টোবর আর জি কর হাসপাতালে গণকনভেনশনে সমবেত হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল এই অঙ্গীকার। উপচে পড়েছিল হল। বাইরে নানা জায়গায় জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে ভিড় করেছিলেন আরও অসংখ্য মানুষ। ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, ছাত্র-শিক্ষক সমাজকর্মী সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এ দিন প্রমাণ করে দিল যে আর জি করে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার ৭৮তম দিনেও এই আন্দোলনের গণচরিত্র পুরো মাত্রায় বর্তমান। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, চিত্র পরিচালক ডাঃ কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আর জি করের মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন

দুয়ের পাতায় দেখুন

● *আর জি কর হাসপাতালে কনভেনশনে উপস্থিত নাগরিকদের একাংশ। ২৬ অক্টোবর*

যদি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতেই না পারে তবে সরকারের দরকার কী

খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিকমানো দূর অস্ত, বরং তা আরও বাড়বে— জানিয়ে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তাদের সাফ কথা, মূল্যবৃদ্ধির হার কবে কমবে সেটা এখনও অনিশ্চিত। এমনকি আগামী কয়েক মাসে তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই (বর্তমান, ১০ অক্টোবর ২০২৪)।

'সাফ কথা' ভালো। কিন্তু যদি তা অকল্যাণকর হয় তাহলে তাকে কেউ ভালো বলে না। ক্ষুদ্র পরিসরে যেমন এ কথা সত্য, তেমনি বৃহৎ পরিসরে এবং যদি সামগ্রিকভাবে ভারতের মতো একটি জনবহুল দেশের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তা অতি মারাত্মক আকার নিতে বাধ্য। দেশের জনসমষ্টির বাঁচা-মরার প্রশ্নের সাথে এই বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অথচ সরকার চুপ করে বসে আছে। কেন?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এই গানের সাথে যথাযথ সঙ্গত করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা তথ্য। মাত্র ১০ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, "খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার সেপ্টেম্বর মাসে পৌঁছেছে ৫.৪৯ শতাংশে, গত নয় মাসে যা সর্বোচ্চ। আগস্ট মাসে এই হার ছিল ৩.৬৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধির হার আগস্টে ৪.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে সেপ্টেম্বরে হয়েছে ৫.৮৭ শতাংশ। শহরে ৩.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫.৫০ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু খাদ্য পণ্যেরই ক্ষেত্রে আনাজের মূল্যবৃদ্ধি ৩৫.৯১ শতাংশ, আলু ৭৮.১৩ শতাংশ, পেঁয়াজ ৭৮.৮২ শতাংশ, ডাল ১২.৯৯ শতাংশ বেড়েছে।"

রাজ্য সরকার লোক-দেখানি একটা টাস্ক ফোর্স করে কিছু অর্থের অপচয় করে চলেছে মাত্র। কার্যকরী কোনও ভূমিকাই তার নেই। বৃহৎ পুঁজিপতি এবং ফাটকাবাজদের স্বার্থই পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে। এর পরিণতি কী?

দুয়ের পাতায় দেখুন

৪ নভেম্বর

সারা দেশে যুদ্ধবিরোধী দিবসে গ্রাম-শহরে বিক্ষোভ-পথসভা

●

কলকাতায় মার্কিন দপ্তরে প্রতিবাদ মিছিল

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি

লড়াইয়ের শপথ জুনিয়র ডাক্তারদের

একের পাতার পর

বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অপূর্ব মুখার্জী, ওই কলেজের রেডিওথেরাপির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী, নার্সেস ইউনিটি-র সম্পাদিকা সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী সহ বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম ডাঃ অনিকেত মাহাত, ডাঃ দেবাশিস হালদার, ডাঃ কিঞ্জল নন্দ, ডাঃ আশফাকউল্লা নাইয়া সহ ডব্লিউবিজেডিএফ-এর নেতৃবৃন্দ সমাবেশের এই বিশালতা দেখে বলেন, প্রশাসনিক বাধা, শাসকের চোখরাঙানি, আন্দোলন ভাঙার বিভিন্ন পদক্ষেপ, আইনি বাধা প্রভৃতি কোনও কিছুই যে আন্দোলনরত ডাক্তার ও সাধারণ মানুষের মনোবলকে এতটুকু টলাতে পারেনি, তাও এদিন আবার প্রমাণিত হয়ে গেল।

দীর্ঘদিন থেকেই এ রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চলছে অরাজকতা। পূর্বতন বামফ্রন্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান শাসক দলের ছত্রছায়ায় মেডিকেল কলেজগুলিতে তৈরি হয়েছে বেপরোয়া দুর্নীতিচক্র। এরা একদিকে যেমন বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির সাথে যুক্ত, আবার এরাই মেডিকেল কলেজগুলির গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করে সর্বত্র ভয়-ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এদের বিরুদ্ধেবলার বা অভিযোগ জানানোর সাহস কারও ছিল না। ছিল না সন্ত্রাসের শিকার হওয়া ব্যক্তির অভিযোগ জানানোর কোনও সুনির্দিষ্ট জায়গা। এই চক্র কলেজে কলেজে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করে থাকে চূড়ান্ত বেপরোয়া ভাবে। মেডিকেল কলেজগুলিতে বিরাজমান এই থ্রেট কালচারের এক চরম পরিণতি হল আর জি করে অভয়ার ঘটনা। এই হাসপাতালের বহিষ্কৃত অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের এক চক্র যা বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি সহ ব্যাপক ভয়-ভীতির পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল। এও জানা যাচ্ছে, সন্দীপ ঘোষ বাহিনী রাজ্যের শাসকদলের সাথে যোগসাজসে যে অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছিল অভয়া তা মেনে নিতে পারেননি। অভয়া তাদের কাছে নতি স্বীকার করেননি বলেই তার এই করুণ পরিণতি। আর এই কারণেই অভয়ার মৃত্যুর প্রকৃত সত্য যাতে সামনে না আসে তার জন্য শুরু থেকেই প্রশাসন সক্রিয়। এই উদ্দেশ্য থেকেই টালা থানায় এফআইআর নিতে দেরি করা, শুরুতে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া, বাবা-মাকে দীর্ঘক্ষণ মৃত মেয়ের কাছে যেতে না দেওয়া, ঘটনাস্থলে বহু লোকজনের আনাগোনা, মৃতদেহ দ্রুত নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী সেমিনার রুমের দেওয়াল ভেঙে ফেলা সহ ধৃত সঞ্জয় রায়কেই একমাত্র দোষী বলে দাগিয়ে দিয়ে বাকিদের আড়াল করার চেষ্টা প্রথম থেকেই বারবার করতে দেখা যায় শাসক দল ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই-এর বয়ান থেকে এ-ও জানা যাচ্ছে যে, সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার আগের চারদিনে বহু তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সাথে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির যুক্ত থাকার সম্ভাবনার বিষয়টিও সামনে আসে সিবিআই-এর বয়ানে।

অন্যদিকে এও সত্য যে যদি ডাঃ অনিকেত মাহাতো ও তাঁর সহকর্মী জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বে সেই দিন কিছু পিজিটি ও ডাক্তারি ছাত্র সত্য জানার জন্য ওই মৃতদেহ সরাতে বাধা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্তের দাবি না জানাতেন, তা হলে শাসকদের অভিপ্রায় সফল হত এবং অন্য বহু ধর্ষণ-খুনের ঘটনার মতো এই ঘটনাও অচিরেই চাপা পড়ে যেত। একই সাথে ওই দিনই ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস সংগঠন হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ দেখায় এবং এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে টালা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সঠিক ভাবে ময়নাতদন্তের দাবি জানান মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাক্তার বিপ্লব চন্দ্র। সে দিনের সময়োপযোগী এই পদক্ষেপই ঘটনার পিছনের প্রকৃত সত্য সামনে আনতে ও সমাজকে জাগিয়ে দিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। উদ্বেলিত করেছিল পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশকে। এই আন্দোলনে জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পথে নেমেছেন। তাঁরা যেমন বিচার চেয়েছেন, প্রকৃত দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন, তেমনি আর জি করের যে সন্ত্রস্ত পরিবেশ অভয়ার এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী তারও অবসান চেয়েছেন।

বিক্ষোভের আগুন দাবানলের মতো পশ্চিমবঙ্গের কোণে কোণে যখন ছড়িয়ে পড়েছে তখন চাপে পড়ে বেশ কিছু মেডিকেল কলেজে শাসক দলের মদতপুষ্ট যে কর্তাব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে থ্রেট কালচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। আর জি করে আন্দোলনের চাপে ৫৯ জনকে সুনির্দিষ্ট এনএমসি অ্যাক্ট মেনে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মাথার উপর শাসক সম্প্রদায়ের হাত থাকায় এদের আবার স্বমহিমায় পুনর্বহাল করার চেষ্টা চলছে। শুধু তাই নয়, আর জি করের গণকনভেনশনের দিনেই তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর আসোসিয়েশন (ডব্লিউবিজেডিএ) নামে একটি পাল্টা সংগঠন ঘোষণা করে। এই সংগঠন নিজেদের অপরাধ ধামাচাপা দেওয়া এবং জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট-এর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমবেত যে আন্দোলন চলছে তাকে কালিমালিপ্ত করা ও ভাঙার উদ্দেশ্যেই যে গড়ে তোলা হল তা কোনও মানুষেরই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাই রাজ্য জুড়ে মেডিকেল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারের মূল অভিযোগ যাদের দিকে তারাই এই নতুন সংগঠনের নেতা। এই সংগঠনের নেতারা আর জি কর হাসপাতাল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে রাজ্যের শাসকদলের এক নেতার সাথে যে মিটিং করে পরামর্শ নিয়েছিল তা তো কারও অজানা নয়। বিগত দিনে ১৯৮৩ সালে সিপিএম সরকারের শাসনকালে জুনিয়র ডাক্তারদের ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে ভাঙতে একইভাবে গড়ে উঠেছিল জেডিসিএ। সংগঠন দুটির উদ্দেশ্য এক। পার্থক্য হল এইটুকু যে তখন ক্ষমতায় ছিল সিপিএম, এখন তৃণমূল।

তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান কোনও মানুষই এই নতুন সংগঠনকে মেনে নিতে পারছেন না। অভয়ার ঘটনা সমাজের সুপ্ত বিবেক ও চেতনাকে যেভাবে জাগিয়ে দিয়ে গেছে তাকে মেরে দিতে শাসকদলের প্ররোচনায় গড়ে ওঠা এই নতুন সংগঠনের সমস্ত হীন প্রচার ও প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার আওয়াজ উঠেছে কনভেনশন থেকে। হাজার হাজার সংগ্রামী কণ্ঠের দৃপ্ত সমর্থনে তা সর্বসম্মত রূপ নেয়।

যখন ন্যায়বিচারের দাবিতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী আন্দোলনের সামিল হচ্ছে, প্রতিবাদে রাত জাগছে, তখন এ রাজ্যের নানুর, জয়নগর, আলিপুরদুয়ার, কৃষ্ণনগর বা অন্য রাজ্যগুলিতে ঘটে চলেছে একের পর এক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা। আর সর্বত্রই চলেছে অপরাধীকে আড়াল করা বা ঘটনাকে লঘু করে দেখাতে শাসকদলের অপচেষ্টার পুনরাবৃত্তি। বাস্তবে এই অপচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একের পর এক হৃদয়বিদারক ঘটনার মূল কারণ। সেই কারণকে দূর করলেই পাওয়া যাবে প্রতিকারের পথের সন্ধান।

সমাজে আজ নীতি-নৈতিকতা ও বিবেক-মনুষ্যত্ববোধের যে চূড়ান্ত সংকট, যা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে শ্রেণিবিভক্ত এই সমাজে শাসক সম্প্রদায়ের টিকে থাকার স্বার্থ। আর মালিক শ্রেণির এই স্বার্থ রক্ষার কাজে শামিল রয়েছে দেশের সমস্ত ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলো। এই দলগুলো মানুষকে বোঝায়— আমাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনো, তা হলেই সমস্যার সমাধান হবে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি ক্ষোভ থেকে অন্য দলকে ভোট দিয়ে শাসন ক্ষমতায় পাঠায়। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। বরং তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। এই শ্রেণি-উদ্দেশ্যকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে।

এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হলে লক্ষ রাখতে হবে লড়াইয়ের অভিমুখটা যেন ঠিক থাকে। যাতে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা যায়, মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যাতে পরিবর্তিত হয়, শাসক সম্প্রদায়ের সমস্ত দুরভিসন্ধিকে যাতে পরাস্ত করা যায়, সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যাতে সংগঠিত ভাবে রুখে দাঁড়ানো যায়। এর জন্য পাড়ায় পাড়ায় শুভবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে একজোট হতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের এই ভয়াবহ পচন ও নারীকে কেবলমাত্র ভোগের পণ্য হিসাবে দেখার এই নোংরা মানসিকতার প্রসার রুখতে তৈরি করতে হবে নারী নির্যাতনবিরোধী অসংখ্য কমিটি। প্রতিটি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে কমিটির সদস্যদের। ভোটবাজ রাজনৈতিক দলের নেতাদের দূরে সরিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাঁদের মধ্য থেকেই উঠে আসা নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে সমাজটাকে ঢেলে সাজাতে। তবেই 'অভয়া'দের মর্মান্তিক পরিণতি রুখতে পারব আমরা।

সরকারের দরকার কী

একের পাতার পর

সংবাদপত্রেই প্রকাশ, ''খাদ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ক্রমেই সামাজিক অবস্থান হারানোর দিকে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে নিম্নবিত্ত হয়ে যাবে। নিম্নবিত্ত হবে দরিদ্র। সেই দিকেই হাঁটছে ভারত'' (বর্তমান,১৮.১০.২৪)। 'জিরো ফুড চিলড্রেন' শব্দটা এখন বেশ পরিচিত। পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে যে অংশটি পর্যাপ্ত খাবার পায় না এবং নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যাদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রবণতা ক্রমবর্ধমান তাদের বলা হয় জিরো ফুড চিলড্রেন। ভারতে মোট শিশুদের ১৯ শতাংশ হল এই জিরো ফুড চিলড্রেন। ল্যানসেট পত্রিকা এবং অন্যান্য সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সব থেকে বেশি জিরো ফুড চিলড্রেন আছে উত্তরপ্রদেশে— ২৮.৪ শতাংশ। ওই রাজ্যে সোনভদ্রা জেলার বিরাওলা গ্রাম থেকে প্রতিদিন জেলাশাসকের অফিসের সামনে রিলে অনশন চালিয়ে আসছেন মূলত আদিবাসীরা। ওখানে দময়ন্তী নদীর বাঁধ নির্মাণের জন্য এলাকার আদিবাসীসহ দরিদ্র মানুষদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের। কিন্তু বেমালুম সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে সরকার। কোনও স্লোগান নেই, কোনও মিছিল নেই, কেবল আমাদের খেতে দাও— এই আবেদন নিয়ে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এসে বসে থাকে দলে দলে নারী-পুরুষ। চরম অমানবিক প্রশাসন দেখেও দেখে না। প্রশ্ন ওঠে, কার জন্য প্রশাসন? কাদের জন্য সরকার? কাদের শ্রম এবং ট্যাক্সের পয়সায় এই প্রশাসনের বাহারি বিলাসব্যসন? সে তো এই চির ক্ষুধার্ত, চির বঞ্চিত শ্রমজীবী এই তাবৎ সভ্যতার স্রষ্টা মানুষগুলিই! এই অধিকাংশ দরিদ্র হাহাকারগ্রস্ত মানুষের ভোটেই সরকার গঠিত হয়। সরকার পোষিত হয়। কেবলমাত্র গুটিকয়েক ধনকুবেরদের ভোটেই তো সরকার গঠন হয় না। কিন্তু সংসদীয় দলের নেতা-মন্ত্রী-আমলারা এ সব কিছুই ভুলে যায়। সেই ভোগী, সেই নিষ্ঠুর প্রশাসনের বিবেকে বিন্দুমাত্র ঘা দিতে না পেরে ১৭ অক্টোবর ওই অনশন মঞ্চেই গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন গোপাল বাজিরাও। ওই মঞ্চেই গোপালের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তাঁর অসহায় প্রশ্ন— সন্তানদের নিয়ে এবার তিনি কী করবেন? বিষণ্ণ গলায় তিনি বলেছেন, ''আমাদের এখানে গোপালরা এভাবেই খিদে থেকে মুক্তি পায়।'' ঠিক এই সময়ে, ভারতে প্রতিদিন গড়ে ১৫৪ জন কৃষক এবং দিনমজুর আত্মহত্যা করছে। আর সর্বজনপরিচিত অমরাবতী? এই জেলার এমন নাম নাকি হয়েছিল এখানে সকলে খেয়ে পরে সুখে থাকে বলে। এই জেলায় ২০২৩ সালে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ৩২৩ (সূত্র - ওই)।

২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় তিনি দ্বিগুণ করে দেবেন। '২২ তো গেলই, '২৩-এর সামান্য তথ্য উপরে উল্লেখিত। '২৪ প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। কোন

তিনের পাতায় দেখুন

প্রধান বিচারপতির ভূমিকায় স্পষ্ট বিচারব্যবস্থাও শাসক শ্রেণিরই স্বার্থে চলে

ভারত ইতিমধ্যেই এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে যিনি দাবি করেন, ঈশ্বরের সাথে সরাসরি সংযোগে তিনি সক্ষম। মর্তের মানুষের গর্ভে নয়, তিনি ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং যা কিছু তিনি করছেন সবই ঈশ্বরের নির্দেশে। দেশের মানুষ কি তা হলে এ বার এমন একজন প্রধান বিচারপতি পেল যিনিও ঈশ্বরের নির্দেশেই রায় দেন!

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় মহারাষ্ট্রের খেড়-এ নিজের গ্রাম কানহেরসারে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, "প্রায়ই আমাদের সামনে এমন অনেক মামলা থাকে, যার কোনও সমাধান মেলে না। অযোধ্যার ক্ষেত্রেও এমন হয়েছিল। আমার সামনে তিন মাস মামলাটা ছিল। আমি ভগবানের সামনে বসে বলেছিলাম, আপনাকেই এর সমাধান খুঁজে দিতে হবে। বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরে আস্থা থাকলে তিনি রাস্তা দেখাবেন।"

অযোধ্যা মামলায় বিচারপতিরা তাঁদের মন্তব্যে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলাটাকে একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু রায় দেওয়ার সময়ে তাঁরা সে কথা বেমালুম 'ভুলে গিয়ে' ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের জায়গাটিকেই রামমন্দির তৈরির জন্য রামজন্মভূমি কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দেশ জুড়ে তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, এই রায়ের সাথে আইনের সম্পর্ক কোথায়! কোন যুক্তিতে তাঁরা এমন রায় দিলেন? উত্তরে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিরা বলেছিলেন, ওই জায়গাটি রামের জন্মস্থান বলে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস, তাই সেই বিশ্বাসকে মান্যতা দিতেই এই রায় দিয়েছেন। সেদিন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিলেন, তা যে সংবিধান তথা আইন মেনে দেননি, তা নিয়ে তাঁদের নিজেদের মনেও কোনও সন্দেহ ছিল না। সে কথাই উঠে এল এ বার প্রধান বিচারপতির কথায়।

প্রধান বিচারপতির অযোধ্যা রায়ের এই ব্যাখ্যা শুনে স্তম্ভিত দেশের সচেতন, গণতান্ত্রিক মনের মানুষ। প্রধান বিচারপতি তাঁর বিদায়ের আগে রায়ের এ কী ব্যাখ্যা দিলেন! এর মধ্যে আইন কোথায়? এ তো প্রধান বিচারপতির একান্ত নিজস্ব বিশ্বাসের বিষয়। ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে এমন একটি স্পর্শকাতর মামলার তো বটেই, কোনও মামলার রায়ই কি দেওয়া চলে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্বাধীন অঙ্গ হিসাবে পরিচিত বিচারব্যবস্থায় বিচারকদের শপথ নিতে হয় যে, একমাত্র সংবিধান এবং আইন মেনেই ভয়হীন এবং পক্ষপাতহীন ভাবে, সাক্ষ্য ও প্রমাণের যথাযথ যাচাই করে তিনি বিচার করবেন। এ বিষয়ে অন্য কোনও কিছু দ্বারা তিনি প্রভাবিত হবেন না। বিচারব্যবস্থার প্রধান হয়েও তিনি সংবিধান এবং আইন মানার এই শপথকেই তো লঙ্ঘন করলেন! এর দ্বারা তাঁর দায়িত্বের প্রতি, পদের প্রতিই তো চরম অবমাননা করলেন।

ভারত একটি ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষ আচরণের কথা বলা হয়েছে তা কি শুধু নির্বাচিত বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিচারপতিদের ক্ষেত্রে নয়? বরং বিচারপতিদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রযোজ্য। এই ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘন হচ্ছে কি না তাঁদের উপরই তো বিচারের ভার! আর তাঁরাই যদি সজ্ঞানে তা লঙ্ঘন করেন, তবে মানুষ বিচারের জন্য যাবে কোথায়! প্রধান বিচারপতি যদি জানেন, তিনি সম্পূর্ণ বেআইনি রায় দিয়েছেন, তবে তাঁর সেই কাজের দায় নিজে না নিয়ে কেন ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপালেন?

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, প্রধান বিচারপতি হঠাৎ এতদিন বাদে অযোধ্যা মামলা রায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে তার এমন ব্যাখ্যা দিতে গেলেন কেন? তবে কি নিজের বাড়িতে গণেশ পুজোয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এই ব্যাখ্যার কোনও সংযোগ আছে? অযোধ্যা রায় নিয়ে জনমনে যে সন্দেহ ছিল তা আরও দৃঢ় হয় যখন বেঞ্চ সদস্য, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবসরের পরেই বিজেপি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। অপর সদস্য বিচারপতি এস এ বোবডে প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন, এস আবদুর নাজির একটি রাজ্যের রাজ্যপাল এবং আর এক সদস্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের প্রধান হয়ে বসেন। সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের কোন রায় কে লিখেছেন, তাতে সেই বিচারপতির নাম থাকে। অযোধ্যা রায়ের ক্ষেত্রে তা ছিল না। যদিও রায় দেখে অনেকেই আন্দাজ করেছিলেন, তা বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের লেখা। এ বার তাঁর এমন মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে, অবসরের আগে প্রধান বিচারপতি কি শাসকদের মনে করিয়ে দিলেন, অযোধ্যার রায় তিনিই লিখেছিলেন? স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে এই প্রশ্ন উঠছে যে তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে কি অবসরের পর কোনও শাঁসালো পদে পুনর্বাসনের প্রশ্নটি জড়িত?

প্রশ্ন আরও যে, মসজিদ ভাঙাটা একটা ঘোরতর অপরাধ, এ কথা মেনে নেওয়ার পরও মসজিদের জমি সেই অপরাধীদের হাতেই তুলে দেওয়া কি শাসক বিজেপির কাছে নতি স্বীকার নয়? বিজেপি-সংঘ পরিবারের তোলা স্লোগান 'মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে'র অনুসারী হিসাবে শাসককে সন্তুষ্ট করতেই কি তাঁর ন্যূনতম ন্যায়নীতি, মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে একতরফা এই রায়? সেই রায়ে তিনি শুধু ধর্মের একটা মোড়ক দিলেন মাত্র— যা কোনও ভাবেই আইনের শাসনের সঙ্গে খাপ খায় না। এত দিন সাধারণ মানুষ যে ভাবত, কোথাও বিচার না পেলে অন্তত আদালতে সঠিক বিচার পাবে, তাঁর এই ভূমিকায় তা-ও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। প্রধান বিচারপতি কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে তাঁর এমন মন্তব্যের যথার্থ তাৎপর্য কতখানি? বিচারব্যবস্থার উপর এর কী ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে?

সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষ আচরণের কথা বলা হয়েছে তা কি শুধু নির্বাচিত বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিচারপতিদের ক্ষেত্রে নয়? বরং বিচারপতিদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রযোজ্য। এই ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘন হচ্ছে কি না তাঁদের উপরই তো বিচারের ভার! আর তাঁরাই যদি সজ্ঞানে তা লঙ্ঘন করেন, তবে মানুষ বিচারের জন্য যাবে কোথায়!

এর পর কোনও মুসলিম বিচারপতি যদি 'আল্লার নির্দেশ' বলে তাঁর পছন্দ মতো কোনও রায় দেন তাকে কি আর অন্যায় বলা যাবে? তেমন হলে প্রধান বিচারপতি কিংবা হিন্দুত্ববাদী নেতারা তা মেনে নেবেন তো?

কিছু দিন আগেই প্রধান বিচারপতি তাঁর বাড়িতে গণেশ পুজো উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে উভয়ের উপস্থিতির ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। সে দিনও বিচার বিভাগের প্রধানের সরকারের তথা শাসক দলের প্রধানকে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর মতো এমন নজিরবিহীন ঘটনায় দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এই ঘটনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় যে সেই সমালোচনাকে কোনও গুরুত্ব দেননি, তা অযোধ্যা মামলা নিয়ে তাঁর বর্তমান ব্যাখ্যাতেই স্পষ্ট।

প্রধান বিচারপতি তাঁর এই ভূমিকার দ্বারা উচ্চ আদালত, নিম্নআদালত নির্বিশেষে বিচারপতিদের কি এই ইঙ্গিতই দিলেন না যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজনের যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই অনুযায়ী বিচারকদের সামাজিক, রাজনৈতিক সংসর্গ বাঁচিয়ে চলার যে রীতি রয়েছে তা মেনে চলার কোনও প্রয়োজন নেই। যে কোনও রাজনৈতিক দল বা তার নেতাদের সাথে বিচারপতিরা চাইলেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে পারেন কি? নানা স্তরের বিচারপতিরা যদি প্রধান বিচারপতির দেখানো রাস্তায় চলতে থাকেন তবে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বলে কি কিছু অবশিষ্ট থাকবে? এর দ্বারা তিনি দেশের মানুষকেই বা কোন বার্তা দিলেন? সংবিধানের আর্টিকেল ৫১এ(এইচ)-এ দেশবাসীর মধ্যে যে বিজ্ঞানভিত্তিক মনন (সায়েন্টিফিক টেম্পার) গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতির আচরণ সেই প্রক্রিয়াতেই আঘাত করল না কি? যদিও বিচারপতি চন্দ্রচূড় দেশজোড়া সমালোচনার সামনে পড়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা যুক্তি তুলছেন। বাস্তবে সে সব ধোপে টেকে না।

কেউ কেউ তাঁর বিচারক জীবনে নানা মামলায় ভাল রায়, নানা ভাল কাজের উল্লেখ করছেন। সে সব কোনও কিছুই এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর এই দুটি কাজ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার যে ক্ষতি করে দিয়ে গেল তা মারাত্মক। যদিও একটি পুঁজিবাদী তথা শ্রেণিরাষ্ট্রে বিচারপতি নিয়োগ করে রাষ্ট্র। সে ক্ষেত্রে জনস্বার্থ নয়, শাসক শ্রেণি তথা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই যে শেষ বিচারে তাঁর কাজ তা-ও প্রধান বিচারপতি আবার প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন এবং সে বিষয়ে আইনের দেবীর মতোই দেশবাসীর চোখের কাপড়ও তিনি খুলে দিলেন।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ

দুয়ের পাতার পর

পরিণতির দিকে এগোচ্ছে দেশ? প্রধানমন্ত্রী 'বিকশিত ভারত'-এর ঢাক পিটিয়ে চলেছেন! কিন্তু কোন সে ভারত? যে ভারতের বিকাশ তিনি ঘটিয়ে চলেছেন? হ্যাঁ, তথ্য বলছে ঠিক এই বছরই নতুন করে ভারতে ৯৪ জন বিলিওনেয়ার হয়েছেন। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় এক বছরের মধ্যে ওই ৯৪ জনের সম্পদ অন্তত পক্ষে ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এই বিলিওনেয়ারের সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে। ফলে বিকাশ তো এদেরই হচ্ছে। ২০১৮ সালে অক্সফামের রিপোর্ট বলছে, ভারতবর্ষের ১ শতাংশ মানুষের হাতে ৫১.৫ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে। এ দিকে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে কেবল ৪.৭ শতাংশ নিয়ে। এটা কি ম্যাজিক, নাকি শোষণব্যবস্থার জাঁতাকল প্রকৃষ্টভাবে পরিচালনার ফল? সেজন্যই আড়ালে আবডালে তো বটেই এমনকি ইলেক্টোরাল বন্ডে খোলাখুলি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নিজেদের পছন্দের রাজনৈতিক দলগুলিকে উজাড় করে দেয় এই পুঁজিমালিকরা এবং নির্বাচন পেরিয়ে গেলেই শতগুণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে তা ফিরিয়ে নেয় সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙে। 'বিকশিত ভারত' আসলে এদেরই স্বার্থ পূরণ করছে। আর এই পরিসর আরো ভালো করে তৈরি করে দেওয়ার জন্যই একযোগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করল, মূল্যবৃদ্ধি হতেই থাকবে। তা রোধ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু জলজ্যান্ত তথ্য কী বলছে? বিগত বছরগুলিতে সব থেকে বেশি দাম বেড়েছে কোন চারটি পণ্যের? চাল, ডাল, তেল, সবজি। আর সব থেকে কম দাম বেড়েছে কোন তিনটি পণ্যের? এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন, স্মার্টফোন এবং রেফ্রিজারেটরের। এ তো সাদা চোখেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। এই সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য সরকারের ভূমিকা কত কূটকৌশলী! ২০১৭-১৮ সালে একটি রিপোর্ট ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস প্রস্তুত করেছিল যা কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করতে দেয়নি, কারণ রিপোর্টের ফাঁস হয়ে যাওয়া অংশ অনুযায়ী তাতে দেখা গিয়েছিল যে, ২০১১-১২-র তুলনায় ২০১৭-১৮-তে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় কমেছে, দারিদ্র বেড়েছে (আনন্দবাজার, ২৪-৫-'২৪)। এই হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত'। এখানে বিকাশ ঘটে শুধু ধনকুবেরদের, আর তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হয় খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ।

পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন

২২ অক্টোবর কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ হলে আয়োজিত হল দেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের একমাত্র সর্বভারতীয় রেজিস্টার্ড সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর

প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যের ১৫টি জেলার দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা অসিত মণ্ডল সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রস্তাবের উপরে ১১ জন শ্রমিক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁদের জীবনের যন্ত্রণার ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অশোক দাস ভিন রাজ্যে কর্মরত এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। বক্তব্য রাখেন যুব আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা নিরঞ্জন নস্কর, পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের বিশিষ্ট নেতা জয়কৃষ্ণ হালদার, জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। সংগঠনের বিশিষ্ট সংগঠক প্রজাপতি খালুয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পরিযায়ী শ্রমিক শেখ নাসিরউদ্দিন পরিবেশিত সঙ্গীত উপস্থিত সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। সম্মেলন থেকে জয়কৃষ্ণ হালদারকে সভাপতি ও জয়ন্ত সাহাকে সম্পাদক করে ৫৯ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

সিএলডব্লিউ মজদুর ইউনিয়নের মনোনয়ন পেশ

সর্বভারতীয় স্তরে রেলের ইউনিয়নের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে আগামী ৪ ডিসেম্বর নির্বাচন হবে। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সিএলডব্লিউ মজদুর

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ২৪ অক্টোবর প্রশাসনের কাছে রেল কর্মচারীরা মিছিল সহযোগে মনোনয়ন জমা দেন। রেল বেসরকারিকরণ, এনপিএস এবং ইউপিএস বাতিল, পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা চালু, নতুন কর্মী নিয়োগ, অফলোডিং, আউটসোর্সিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্বার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে এই নির্বাচনে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিপুল ভোটে মজদুর ইউনিয়নকে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

কৃষ্ণনগরে ছাত্রীর মৃত্যু
দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

১৬ অক্টোবর নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে পুলিশের এসপি অফিস থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর পুড়ে যাওয়া মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতার পরিজনদের অভিযোগ, ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাকে। ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গেই এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর কর্মীরা থানায় ছুটে যান।

দাবি করা হয় বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে হবে। প্রশাসন সেই দাবি মানতে বাধ্য হয়। নিরপেক্ষ তদন্ত, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দ্রুত বিচার করে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে১৭ অক্টোবর কৃষ্ণনগর থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং শহরজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়।

কারা শত্রু, কারা বীর
গুলিয়ে দিচ্ছে গেরুয়া শিবির

সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডে দুই অভিযুক্ত— পরশুরাম ওয়াঘমারে ও মনোহর যাদভে সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ বিজয়পুরায় নিজেদের এলাকায় ফেরার পরই মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে তাদের বরণ করতে স্থানীয় আরএসএস-বিজেপি ঘনিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারা এদের 'বীর' বলে আখ্যা দেয়।

আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগে— কারা বীর? বীরগাথা লেখা হয় কাদের জন্য? যাঁরা দেশের জন্য, দেশের লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার শর্তে হাসতে হাসতে নিজের জীবন বাজি রাখতে জানেন, প্রকৃত বীর তাঁরাই। কিন্তু আমরা দেখলাম দেশের সেই সাধারণ মানুষের কেউ নয়, সাম্প্রদায়িক উগ্রতাকে ভিত্তি করে বিজেপি-আরএসএস এদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা কয়েকটি সংগঠন সাংবাদিক হত্যায় অভিযুক্তদের বীরের সম্মান দিল। কেন দিল? ২০১৭-র ৫ সেপ্টেম্বর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দুই কর্মী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করে। রাজ্য সরকার গঠিত সিট ২০১৮-তে জানিয়েছিল ওয়াঘমারে হত্যার কথা কবুল করেছে। তার কাছ থেকে হত্যার অস্ত্রও উদ্ধার করেছিল পুলিশের বিশেষ অনুসন্ধানী দল। গৌরী লঙ্কেশ এক স্বাধীন সাংবাদিক, যিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদের সমালোচক ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে তথাকথিত নিম্নবর্গদের অধিকার, নারীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়ে নানান ধর্মীয় কুপ্রথার সমালোচনা করতেন। বিজেপির উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ভাষ্যের সঙ্গে এটা আলাদা। কিন্তু মতের সঙ্গে না মিললে বা কেউ সমালোচনা করলেই কি তাকে হত্যা করা যায়? এর জবাব হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিকে দিতে হবে। কী করে সেই হত্যাকারীরা বীর হয়?

এদের বীরত্ব নির্ধারিত হচ্ছে কি বিজেপির ভোটের লাভ থেকে? না হলে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই ওই দু-জনকে মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোটের শরিক একনাথ শিন্দের নেতৃত্বে চলা শিব সেনায় ঘটা করে যোগ দেওয়ানো হল কেন? বিজেপি যখন বিলকিস বানোর ধর্ষকদের সংবর্ধনা দিয়েছিল তার অল্প দিনের মধ্যেই ছিল গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন। কাঠুয়ায় আট বছরের শিশুর ধর্ষক এবং খুনিদের পক্ষেও তারা আওয়াজ তুলেছিল ওই বছর ছত্তিশগড়, কর্ণাটকে নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদের হাওয়া তোলার স্বার্থে। এই ভোট রাজনীতির লাভের হিসাবে থেকেই বিজেপি মারাত্মক খুনিদের বীর সাজিয়েছে। আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ভোট হারানোর ভয়ে সব দেখেও চুপ! আরএসএস-বিজেপি ও গেরুয়া শিবিরের কাছে শত্রু কারা? যদি আপনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করেন আর আরএসএস-বিজেপি ও গেরুয়া শিবিরের তা না-পসন্দ হয়, তবে আপনি তাদের শত্রু হয়ে যেতে পারেন। যেমন করে তারা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল মহারাষ্ট্রের চিকিৎসক-সমাজসেবী-যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের নেতা, লেখক নরেন্দ্র দাভোলকরকে, তেমন করেই শত্রু বলে প্রতিপন্ন করেছে কন্নড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমূল সংস্কারপন্থী এম এম কালবুর্গীকে, বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও লেখক গোবিন্দ পানসারেকে। বছরের পর বছর কেটে গেলেও কোনও হত্যাকারীর শাস্তি হয়নি।

আরএসএসের তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকরের মতে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানীরা যেহেতু মুসলিমদের পরিবর্তে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছেন, তাই তাঁরা বিশ্বাসঘাতক। হবে নাই বা কেন। একদিন হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের ভারত আগমণকে প্রশস্তি করে বলেছিল 'ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আর্য জাতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা যা সুদূর অতীতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, আবার এক হতে পেরেছে। এক জাতি অপরটিকে রাজনৈতিক পথনির্দেশ ও সুরক্ষা প্রদান করছে। যে সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যায় না, তার প্রজা হিসেবে আমরা গর্বিত এবং এই প্রাপ্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।' একই দর্শন নিয়ে চলা হিন্দু মহাসভা, আরএসএস তাই কখনওই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেনি, অংশগ্রহণ তো দূরের কথা। আর সে কারণেই তাদের চোখে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী ক্ষুদিরাম বসু-বিনয়-বাদল-দীনেশ-মাস্টারদা সূর্য সেন-প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-রামপ্রসাদ বিসমিল-আসফাকুল্লারা দেশদ্রোহী-বিশ্বাসঘাতক। এই হিন্দু মহাসভা, আরএসএস এর উত্তরসূরী বিজেপি ও গেরুয়া শিবির ভারতের সত্য ইতিহাসকে অস্বীকার করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহান মানুষেরা নয়, ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া, তাদের সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিনায়ক দামোদর সাভারকর এদের কাছে বীর। আর দেশপ্রেমিক কারা? গোলওয়ালকর বলেছেন, 'আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এ কথাই বলে যে, সমস্ত কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা।' এই যুক্তির ভিত্তিতে যে হিন্দুরা অহিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে তারা দেশপ্রেমিক। কোন অন্ধকার, পুতিগন্ধময় চিন্তার দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত ভাবতে পারেন! আমার আপনার কাছে যা ইতিহাস, যা দেশকে ভালোবাসা, যা বীরত্ব, যা মূল্যবোধের উৎস সে সবকিছুকেই নস্যাৎ করতে চায় আরএসএস-বিজেপি ও গেরুয়া শিবির। মানবতার ঘৃণ্য শত্রুদের বীরের তারা সম্মান দেয়। ফলে এটা স্বাভাবিক যে, এদের চোখে গৌরী লঙ্কেশ হত্যায় অভিযুক্তরাই বীর বলে গণ্য হবে। আবার একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, হত্যা ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের এই সংবর্ধনার পিছনে, অন্য কিছু নয়, আসলে রয়েছে হিন্দু ভোট একজোট করে নির্বাচনী ফয়দা লোটারই পরিকল্পনা। সাধারণ মানুষ যত দ্রুত এদের স্বরূপ চিনতে পারে ততই মঙ্গল।

পেমেন্ট কোটা বাতিলের দাবিতে কর্ণাটকের দাভাঙ্গেরেতে বনধ

কর্ণাটকে প্রথম সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ‘ইউনিভার্সিটি ব্রহ্মাপ্পা দেবেন্দ্রাপ্পা টাভানাপ্পানাভার কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং’ (ইউবিডিটি) ১৯৫১ সালে তৈরি হয়েছিল দাভাঙ্গেরে এলাকার বহু মানুষের দানে। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই কংগ্রেস পরিচালিত কর্ণাটক রাজ্য সরকারের শিক্ষার পণ্যায়ন ও বেসরকারিকরণের নীতি বিখ্যাত এই কলেজটিকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ঠেলে দিতে চাইছে।

ধর্মঘটের দিন এআইডিএসও কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ

বর্তমানে কর্ণাটকে সমস্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফি বাড়িয়ে ৪৭ হাজার টাকা করে দেওয়ায় সেখানে ভর্তি হওয়া দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। এমন সময়ে ইউবিডিটিও তার ৫০ শতাংশ আসনে ‘পেমেন্ট কোটা’ চালু করে ৯৭ হাজার টাকা ফি-র বিনিময়ে ছাত্র-ভর্তির কথা ঘোষণা করেছে। এমনকি কোনও প্রশাসনিক নোটিশ ছাড়াই সেখানে এই কোটা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন কর্ণাটকের মানুষ। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে গত একমাস ধরে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসা সত্ত্বেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। ইউবিডিটি-তে ৫০ শতাংশ পেমেন্ট-কোটা বাতিলের দাবিতে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মন্ত্রী সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে জানায়, শিক্ষা এখন আর সরকারের দায়িত্ব নয়।

এই অবস্থায় দাবি আদায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের মতামত নেয় এবং ‘ইউবিডিটি বাঁচাও’-এই ব্যানারে একযোগে ১৬ অক্টোবর দাভাঙ্গেরে বনধের ডাক দেয়। এলাকার মানুষের পাশাপাশি শ্রমিক, কৃষক, দলিত, বাম ও প্রগতিশীল মানুষের ৪৫টি সংগঠন শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে এই বনধে সামিল হয়। বনধের সমর্থনে শহরজুড়ে হাজার হাজার পোস্টার লাগানো হয়। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে ছাত্রদের সঙ্গে বনধের প্রচারে সামিল হন।

১৬ অক্টোবর কর্ণাটকের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন। ইউবিডিটি কলেজে পেমেন্ট-কোটা বাতিলের দাবিতে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করেন। প্রশাসন থেকে বার বার বনধ ব্যর্থ করার আবেদন জানানো সত্ত্বেও গোটা শহর সেদিন ছিল স্তব্ধ, এমনকি ফুটপাতের ছোট ছোট দোকানগুলিও বন্ধ ছিল। বনধ ডাকা বেআইনি বলে ঘোষণা করে ছাত্রনেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করলে কৃষক ও দলিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ব্যাপক সংখ্যায় সমবেত হয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান এবং পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ছাত্রনেতাদের অবিলম্বে মুক্তি না দিলে তাঁরা হাইওয়ে ও রেললাইন অবরোধ করবেন। চাপে পড়ে পুলিশ গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের ছেড়ে দেয়। সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে দাভাঙ্গেরের মানুষের এই প্রতিবাদ কর্ণাটক রাজ্য ও গোটা দেশের সামনে নজির হয়ে থাকল।

শহিদ আসফাকউল্লা খান স্মরণে

২২ অক্টোবর স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী আসফাকউল্লা খানের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয় হাওড়ার কাজিপাড়ায়। শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ আসফাকউল্লা খানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কমিটির সদস্য রঞ্জন রায় সহ এলাকার ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকবৃন্দ।

এসএসকেএমে নতুন মোড়কে ভাঙা কাঁচি! প্রতিবাদ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের

সম্প্রতি এসএসকেএম হাসপাতালে নতুন প্যাকেটে ভাঙা কাঁচি পাওয়া গেছে। কয়েক দিন আগে আর জি কর হাসপাতালে রক্তমাখা গ্লাভস পাওয়া গিয়েছিল। বিভিন্ন হাসপাতালে মাঝে মাঝেই নতুন মোড়কে রক্তমাখা নিডল পাওয়া যাচ্ছে, আই ভি স্যালাইন বা অ্যানেস্থেটিক ড্রাগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় রোগীর মৃত্যুও ঘটছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ২৮ অক্টোবর সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে যে ভাবে ছেলেখেলা চলছে, তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এক ধরনের অসাধু সিন্ডিকেট ও স্বাস্থ্য-মাফিয়ারা শাসকদল ও প্রশাসনের সক্রিয় মদতে যে দুর্নীতিচক্র চালাচ্ছে, তারই পরিণামে এই পরিস্থিতি। দীর্ঘদিন ধরে এরা চিকিৎসা-সরঞ্জাম ও ওষুধ নিয়ে মারণ-ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে বহু বার স্বাস্থ্যভবনে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি সরকার।

তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, এই ধরনের চূড়ান্ত অনৈতিক মারণ-ব্যবসা ও সিন্ডিকেট-রাজ অবিলম্বে বন্ধ না করলে চিকিৎসক সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

৯৪ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে সভা

নানা অজুহাত তুলে মধ্যপ্রদেশ সরকার ৯৪ হাজার স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। প্রতিরোধে গুনা শহরের প্রগতিশীল মানুষ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের নেতা মুরারী শর্মা। সঞ্চালনা করেন মোহর সিং লোধী। এঁরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডাঃ পুষ্পরাজ শর্মা, সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক সচিন জৈন প্রমুখ। বক্তারা

একজোট হয়ে একটি সংঘর্ষ কমিটি গঠন করেছেন। তাঁদের ডাকে ২৩ অক্টোবর অগ্রওয়াল ধর্মশালায় শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। সভাপতিত্ব করেন প্রত্যেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া এই নীতিরই অঙ্গ। তাঁরা জানান, সরকারি স্কুল বন্ধ করে সাধারণ দরিদ্র-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের কাছ থেকে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। স্কুল রক্ষায় গ্রাম-শহর জুড়ে মানুষকে সংগঠিত করে সংঘর্ষ কমিটি তৈরির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন তাঁরা।

চণ্ডীগড়ে পার্টির বুকস্টল

১২ অক্টোবর

পাঠকের মতামত

ফাটছে ফানুস, কাটছে ঘোর

বর্তমান দিনের ভয়াবহ আর্থিক সংকট ও বেকারত্বের মধ্যেও পারিবারিক দৈন্য যতটা ঘোচানো যায়, এমন স্বপ্ন চোখে নিয়েই অগ্নিবীর প্রকল্পে যোগ দিয়েছিল ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার সুখজোড়া গ্রামের সৈকত সিট। কিন্তু তার স্বপ্ন রয়ে গেল অধরাই। পুজোর সমস্ত আনন্দ উৎসাহ ম্লান করে গত দশমীর দিনে বাড়িতে ফিরল তার কফিনবন্দি দেহ। তবে শুধু সৈকত নয় ওই দিন অনুশীলন চলাকালীন ওর আরও একজন সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

সৈকত সিট বা তার সহকর্মীর মৃত্যুতে এদের পরিবারের সাথে আমরাও বেদনাহত। তবে সৈকতের মৃত্যুই কেবল একটি আকস্মিক ভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা নয় বরং ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে বিজেপি সরকারের অপরিকল্পিত অগ্নিপথ প্রকল্পের জন্য এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কুড়িজন আত্মহত্যা করেছেন, অনুশীলন চলাকালীন আরও অনেকেই মৃত্যুর কবলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে তো নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেশি।

কী এই অগ্নিবীর প্রকল্প? এই প্রকল্প আনা হয়েছিল যখন সারা দেশে করোনা অতিমারিতে মানুষ বিধ্বস্ত। এই প্রকল্পে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে ১৭ থেকে ২৩ বছর বয়সী নির্বাচিত প্রার্থীদের চার বছরের জন্য নথিভুক্ত করা হয়। সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা এবং সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা প্রবর্তিত নীতির উপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থানের মেয়াদ শেষ করার পরে অগ্নিবীরদের স্থায়ী ক্যাডারে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়ার কথা। এদের সর্বাধিক ২৫ শতাংশকে নিয়মিত ক্যাডার হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীতে নথিভুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করা হবে বলা হয়েছে। বেশিরভাগ অগ্নিবীরকে চার বছর পর কিছু টাকা দিয়ে দায়িত্ব সেরে দেবে সরকার।

এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি তুলে ধরতে বিজেপি সরকার নিজেদের নেতা-মন্ত্রীদের ছাড়াও কাজে লাগিয়েছে সেনাপ্রধানদের। এই অগ্নিবীর প্রকল্প আনার ক্ষেত্রে তারা কোনও রকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করেনি বা অভিজ্ঞ কোনও সেনানায়কদের সঙ্গেও কথা বলেনি।

অগ্নিবীরদের চাকরি অন্তে নেই কোনও পেনশনের সুবিধা বা কোনও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা। এমনকি তাদের জীবনের নিরাপত্তাও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। বাস্তবে বেকার সমস্যায় জেরবার দরিদ্র পরিবারের যুবকদের লাচারির সুযোগ নিয়ে তাদের পুরোপুরি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সরকার। তবে আশার কথা এই যে, যতই মন-ভোলানো চমকপ্রদ কথার আড়ালে মাতিয়ে মানুষকে এগুলিতে মজিয়ে রাখার চেষ্টা হোক না কেন, ধীরে ধীরে সেই মোহ ভাঙছে। মানুষ অন্যান্য সংস্কারগুলির সাথে সাথে এই সেনাবাহিনী কেন্দ্রিক সংস্কারের মধ্যে সরকারি ভাঁওতাবাজি ধরতে পারছেন এবং তার বিরুদ্ধে সজাগ হচ্ছেন।

তনুশ্রী বেজ
মেদিনীপুর

মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড লেনিন

একের পাতার পর

আসে। নির্বাসন ও ফাঁসি দিয়ে নারদনিকদের মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে নারদনিকদের মধ্যে যারা গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সচেষ্ট ছিলেন তাদেরই একটি দলের নেতা ছিলেন লেনিনের দাদা আলেকজান্ডার উলিয়ানভ, যাঁকে জার সরকার ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। প্লেখানভ সহ অনেকেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা বিদেশে কার্ল মার্ক্সের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। নারদবাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে সংগঠিত ও শ্রেণি সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝলেন। মার্ক্সবাদীরা নিজেদের যে নামে পরিচয় দিতেন সেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নামে নিজেদের অভিহিত করলেন তারা। রুশ দেশে মার্ক্সবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ সালে তারা জেনেভাতে গঠন করলেন 'শ্রমিকমুক্তি গোষ্ঠী।'

শ্রমিকমুক্তি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়ার মাটিতেও মার্ক্সবাদের প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা তৎকালীন রাশিয়ার প্রভাবশালী নারদবাদের চিন্তার কাছে বাধা পাচ্ছিলেন সবচাইতে বেশি। নারদনিকরা মনে করত ১) কৃষকরাই হল বিপ্লবের প্রধান শক্তি, কারণ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। একমাত্র কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমেই জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা যাবে, ২) রাশিয়ায় পুঁজিবাদ একটি আকস্মিক বিষয়, সেখানে এর কোনও বিকাশ ঘটবে না এবং সর্বহারা শ্রেণিরও সেখানে বিকাশের কোনও সম্ভাবনা নেই, ৩) সর্বহারা বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্বকারী শ্রেণি নয়। ফলে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণিকে বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্রের চিন্তা করতেন, ৪) তাঁরা মনে করতেন শ্রেণি সংগ্রামের ফলে ইতিহাস সৃষ্টি হয় না, ইতিহাস সৃষ্টি করে কয়েকজন বীর। জনগণ এই বীরদের অনুসরণ করে মাত্র। এই চিন্তাকে আদর্শগত ভাবে পরাজিত করা ছিল জরুরি। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন লেনিন।

মার্ক্সবাদী পাঠচক্রের মাধ্যমে মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন লেনিন

নারদনিকদের এই ভুল চিন্তার বিরুদ্ধে প্লেখানভ বললেন— রুশ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ইতিমধ্যেই হয়েছে, সেই বিকাশকে ঠেকানোর সাধ্য তাদের নেই, মূল কাজ হল পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে যে বিপ্লবী শক্তি জন্ম নিচ্ছে সেই শ্রমিক শ্রেণিকে সচেতন ও সংগঠিত করা। তাদের নিজস্ব পার্টি গড়ে তোলা। এক কথায় শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবে সামিল করা। ইতিমধ্যেই কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছরের জন্যে নির্বাসিত হন বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইনের ছাত্র লেনিন। নির্বাসিত অবস্থায় ও তার পরবর্তী বছরগুলোতে গুপ্ত বেআইনি মার্ক্সবাদী পাঠচক্রের মাধ্যমে মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন লেনিন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে তখন শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। রেলওয়ে, খনি শিল্প ও বড় বড় কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। তাদের জীবন যেমন কষ্টের তেমনই দুর্দশার। দৈনিক কাজের সময় ১২-১৬ ঘণ্টা। ওই সময় শ্রমিকদের কোনও সংগঠন ছিল না। শ্রমিকদের প্রতিবাদ হত স্বতঃস্ফূর্ত। শোষণ ছিল নির্মম, শ্রমিক প্রতিবাদীদের উপর নেমে আসত কারাবাস, নির্বাসন ও প্রাণদণ্ড। এই অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে দিকে দিকে মাথা তুলছিলেন কারখানায় কারখানায় শ্রমিকরা। শ্রমিকদের সংগঠিত করতে মার্ক্সবাদীরাও সচেষ্ট হন। এই সময়ই লেনিন চেষ্টা করতে থাকেন শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলতে।

শ্রমিক শ্রেণির দল তৈরির প্রচেষ্টা

১৮৯৪ সালের শেষ দিকে সেমিইয়ানিকভ কারখানায় অশান্তির সময় লেনিনের লেখা একটা ইস্তেহার বিতরণের পর তার ফলাফল দেখে মার্ক্সবাদীরা উৎসাহিত হলেন। তার পর নেভি বন্দরের শ্রমিক ধর্মঘটের সময় 'ডক শ্রমিকদের লড়াই কিসের জন্য' শিরোনামে আরও একটি ইস্তাহার শ্রমিকদের মধ্যে ও শহরের অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়া হল। এর ফলে নেভি বন্দরের ধর্মঘটী শ্রমিকরা জয়ী হলেন। লেনিন যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গ আসেন, সেই সময় শ্রমিকদের ছোট ছোট মার্ক্সবাদী বেআইনি পাঠচক্রের মাধ্যমে মার্ক্সবাদ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হত, কিন্তু রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্সবাদ নিয়ে যাবার লেনিনের এই নব প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগলো, প্রবল উৎসাহিত হলেন মার্ক্সবাদীরা।

১৮৯৫ সালে লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এর সমস্ত শ্রমিক পাঠচক্রকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুললেন 'শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম সংঘ।' লেনিনের পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম সংঘ শ্রমিকদের পরিচালিত অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের সঙ্গে জার শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামকে এক সূত্রে গ্রথিত করে, রাশিয়াতে সর্বপ্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য সাধনের সূচনা করলেন। রাশিয়ার বিপ্লবীদের জীবনে এই ঘটনাটি সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, 'সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রাম সংঘের গুরুত্ব হল শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিপ্লবী পার্টির সূত্রপাত।' শুরু হল শ্রমিক শ্রেণির দল তৈরির প্রচেষ্টা। পার্টি কী ভাবে গড়ে তুলতে হবে তার সুনির্দিষ্ট বিশদ পরিকল্পনা উপস্থিত করে ১৯০১ সালে ইস্ক্রার সম্পাদকীয়তে 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে'— এই শিরোনামে লেনিন লিখলেন, পার্টি তৈরির ক্ষেত্রে একটি 'সারা রুশ পত্রিকা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। লেনিন বললেন, পত্রিকার মারফত খবর ছড়িয়ে দিতে হবে, পত্রিকার মারফত আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে, তারপরেও পত্রিকার দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না, পত্রিকার মাধ্যমে পার্টির সংগঠনও গড়ে তুলতে হবে। একজন শ্রমিক ইস্ক্রার দপ্তরে পাঠানো তার চিঠিতে লিখলেন, 'আমার বিদ্যে অল্প, কিন্তু ইস্ক্রা পড়ে আমি জানতে পেরেছি সত্যটা কী। লিখলেন, মেহনতি মানুষ প্রচণ্ড তেতে আছে, শুধু একটি স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ার অপেক্ষা, স্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে উঠবে আগুন। আগেও কারখানায় হরতাল হত, কিন্তু সেটা ছিল ঘটনামাত্র। এখন শ্রমিকরা বুঝতে পারছে, শুধু একটা হরতাল হওয়াটা কিছু নয়, হরতালকে নিয়ে যেতে হবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে। লেনিনের যুগটা সাম্রাজ্যবাদের যুগ। হাতে কলমে বিপ্লব করার যুগ। এই যুগে লেনিনীয় তত্ত্বই হল মার্ক্সবাদ। যাঁরা এটা বোঝেননি, তাদের বিরুদ্ধে প্রবল আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। এই পথেই স্ট্যালিনের আবির্ভাব।

শ্রমিকদের শ্রেণি চেতনা যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা ততক্ষণ হয়ে ওঠে না, যতক্ষণ না সে সব ধরনের স্বৈরাচার, নির্যাতন, হিংসা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য শিক্ষিত হয়। শ্রমিক শ্রেণির চেতনা যথার্থ রাজনৈতিক হতে পারে না, যদি শ্রমিকরা সুনির্দিষ্ট ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে।

অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ঘেরাটোপে শ্রমিক আন্দোলনকে আটকে ফেলার অর্থ মজুরি দাসত্বের জীবনকেই চূড়ান্ত মনে করা

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের উপর মালিকরাও সর্বপ্রকার আক্রমণ বাড়াতে থাকে। আবার তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে শ্রমিক ধর্মঘট, শ্রমিক সংগ্রাম। ক্রমবর্ধমান এই শ্রমিক সংগ্রামের আবহেই এই সংগ্রাম দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে অর্থনীতিবাদীরা মনে করতেন শ্রমিকরা শুধু অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে লড়বে, রাজনৈতিক সংগ্রামে তারা অংশগ্রহণ করবে না, রাজনৈতিক সংগ্রাম করবে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা। অন্য দিকে লেনিনের নেতৃত্বে যথার্থ মার্ক্সবাদীরা মনে করতেন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ঘেরাটোপের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনকে আটকে ফেলার অর্থ হল তাদের মজুরি দাসত্বের জীবনকেই চূড়ান্ত বলে মনে করা। তাই লেনিন বললেন, শ্রমিকদের শ্রেণি চেতনা যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা ততক্ষণ হয়ে ওঠে না, যতক্ষণ না সে সব ধরনের স্বৈরাচার, নির্যাতন, হিংসা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য শিক্ষিত হয়। শ্রমিক শ্রেণির চেতনা যথার্থ রাজনৈতিক হতে পারে না, যদি শ্রমিকরা সুনির্দিষ্ট ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে। তিনি বললেন, যদি তারা সমস্ত শ্রেণি, গোষ্ঠী ও জনগণের সমস্ত অংশের জীবনধারার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করতে না পারে, বস্তুবাদী বিশ্লেষণকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে না

সাতের পাতায় দেখুন

রেল লাইনের নামে যথেচ্ছ জমি অধিগ্রহণ
বিপদে কাশ্মীরের আপেল চাষিরা

কাশ্মীর প্রধানত একটি পর্যটনপ্রধান রাজ্য হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত হলেও, এর মূল অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে কৃষির উপর। বিশেষ করে আপেল চাষের উপর। বছরের পর বছর কাশ্মীরের মানুষ হাজার হাজার বর্গ-কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আপেল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

তাঁদেরই একজন মহম্মদ সফী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আপেল চাষিরা এক ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে। সদ্য পরাজিত পূর্বতন বিজেপি পরিচালিত কাশ্মীর সরকার সারা রাজ্য জুড়ে রেললাইন পাতা শুরু করেছে। বলা হচ্ছে এতে নাকি কাশ্মীরের পর্যটন ও শিল্পায়ন আরও বিকশিত হবে। এদিকে এর জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করছে সরকার। ফলে আপেল চাষিরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

অবসরপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি সার্জেন এবং জামরুটের বাসিন্দা পিয়ার সিং-এর কথায় গ্রামের অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষি ও দুগ্ধ খামারের ওপর নির্ভরশীল। জমি হারালে তারা অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। জীবিকা হারাচ্ছেন, পথে বসছেন গ্রামের মানুষ।

ঠিক একই কথা মহম্মদ শফিরও, যার জমির উপর দিয়ে এখন চলে গেছে কংক্রিটের রেলপোল। এখন এই জমির মালিক সরকার, যারা জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের নামে এখান থেকে মহম্মদ শফির মতো আরও অনেক কৃষককে উৎখাত করবে।

আপেল চাষিরা উদ্বিগ্ন। কাশ্মীরের মোট আয়ের বেশ বড় অংশ আসে এই আপেল চাষ থেকে। বহু পরিবারের জীবন ও জীবিকা এই আপেল চাষের উপর নির্ভর করে আছে। কিন্তু সেই আপেল চাষই এখন ধ্বংসের মুখে। জমি অধিগ্রহণ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার মানুষ আন্দোলন তো দূর, প্রতিবাদ করতেও পারছেন না। প্রতিবাদ করলেই মারধোর, পুলিশি ও মিলিটারি অত্যাচার আর দেশদ্রোহীর তকমা। সরকারকে জিজ্ঞেস করা হলে তাদের একটাই উত্তর— ক্ষতিপূরণ তো দেওয়া হবে। কী ক্ষতিপূরণ, কত ক্ষতিপূরণ, আদৌ সেই ক্ষতিপূরণ সবাই পাবে কি না, কবে থেকে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, সেই ক্ষতিপূরণ কতটা ন্যায্য ইত্যাদি প্রশ্নের সরকারের কোনও উত্তর নেই।

অনেকেই মনে করেন রেল, সড়ক ইত্যাদি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন মানেই সামগ্রিক উন্নতির সুযোগ খুলে দেওয়া। বাস্তব কি তাই? এ দেশে সড়ক, রেল, শিল্প যাই হোক না কেন তাতে কিছু লোকের উন্নতি, রোজগার হয় না এমন নয়। কিন্তু এর মূল লক্ষ্য থাকে পুঁজিপতি শ্রেণির উন্নয়ন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে— 'কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল?'

২০১৯-এর ৫ আগস্ট মোদি সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়। তখন থেকে তা কেন্দ্রশাসিত এলাকা হয়ে গেছে। ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ ধারার অবলুপ্তির পর বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি মালিকরা সেখানকার জমির দখল নেওয়ার আশায় লালায়িত। মাঝারি কৃষকদের উচ্ছেদ করে তারা বড় বড় ফার্ম করবে। রেল সেই ফার্মের পণ্যপরিবহণে সাহায্য করবে— এই তাদের আশা। এর সাথে আছে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাদের লাভের হিসাব। জনগণ জমি দেবে, লাভে তুলবে কর্পোরেট মালিক। একেই বলে পুঁজিবাদী উন্নয়ন।

দেশের অন্যান্য অংশের মতো কাশ্মীরও তার ব্যতিক্রম নয়। ৩৭০ ধারা রদ করেই মোদি সরকার দাবি করেছিল কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ প্রচুর কাজ পাবে, পাবে শিল্পায়নের সুবিধা, আর পাবে সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে সুরক্ষা। বর্তমানে এই তিনটিই আকাশকুসুম হয়ে থেকে গেছে, বরং বেড়েছে মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। বেড়েছে প্রতিবাদী মানুষকে গ্রেপ্তার ও তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা। ফলে আজ এই আপেল চাষিরা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত তাই নয়, তাদের বেঁচে থাকা মারাত্মক সঙ্কটের মুখে।

কাশ্মীরী পরিবেশকর্মী রাজা মুজাফফর ভাটের কথায়— 'হ্যাঁ, রেললাইনের প্রয়োজন অবশ্যই। কিন্তু শোপিয়ান, অনন্তনাগ এবং অন্যান্য জেলার মধ্য দিয়ে রেললাইনের জন্য প্রচুর গাছ কাটা পড়বে, যা এই অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষের জীবিকাকে ঝুঁকিতে ফেলবে। তিনি আরও বলেন— 'এই রেললাইন কোনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরামর্শ না করে, কথা না বলে, তাদের মতামত না নিয়েই করা হয়েছে, যা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী।' দিল্লি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কাশ্মীর আর কাশ্মীরীদের জন্য নেই।

বোঝা যাচ্ছে কাশ্মীরের শীতল হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। জীবন-জীবিকা হারানোর মুখে দাঁড়িয়ে যে কোনও সময় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়বে। কারণ পেট বড় বালাই।

লেনিন ঃ মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক

ছয়ের পাতার পর

পারে— এই যথার্থ শ্রেণি চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া থেকে আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে লেনিন বললেন, 'শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক শ্রেণি চেতনা একমাত্র বাইরে থেকে আসতে পারে। এর অর্থ হল, আসতে পারে একমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের বাইরে থেকে শ্রমিক ও মালিকের সংগ্রামের বাইরে থেকে। একমাত্র সমস্ত শ্রেণির মধ্যে সম্পর্কের ভিতর দিয়েই এই জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা দেওয়ার অর্থ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের (তখন কমিউনিস্টদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বলা হত) অবশ্যই জনগণের সমস্ত শ্রেণির মধ্যে যেতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের অগ্রগামী বাহিনীকে পাঠাতে হবে। এ ভাবে লেনিন শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব সম্পর্কে তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ রেখেছেন। বলেছেন, চেতনার গুরুত্বকে খাটো করলে শ্রমিকদেরই অপমান করা হয়। পার্টির কাছে তত্ত্বের গুরুত্বকে খাটো করলে সেই হাতিয়ারটিকে খাটো করা হবে যার সাহায্যে পার্টি বর্তমানকে বুঝেছে, ভবিষ্যতকে দেখেছে। তাই লেনিন বলেলেন 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না। ... যে পার্টি সব থেকে অগ্রসর তত্ত্বের দ্বারা চালিত একমাত্র সেই পার্টি পারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে।'

লেনিন রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের সাথে বিতর্কে লেনিন বললেন— নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের স্বার্থে এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে পারে না। তাদের দায়িত্ব হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করা, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ দেশে বিপ্লব সমাধা করার চেষ্টা করা। রুশ দেশের যে আসন্ন বিপ্লবের কথা লেনিন বলেছিলেন তার সূত্রপাত ১৯০৫-এর শুরুতেই। সারা রুশ দেশ হয়ে উঠল মিছিলে মিছিলে উত্তাল। ব্যারিকেড খাড়া হল শ্রমিকদের, রাস্তায় রাস্তায় জারের সৈন্যদের সঙ্গে চলতে থাকল সংঘর্ষ। রুশ দেশের শ্রমিকরা দুর্জয় সাহসে একজোট। তাদের দাবি এ বার আর অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক।

শ্রমিক আন্দোলনের এই উত্তাল তরঙ্গ রোধ করে এ সাধ্য কার? জারের সৈন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল। কয়েকশো শহিদের বুকের রক্তে আরও রাঙা হয়ে উঠল লাল ঝান্ডা। মে মাসে সারা দেশে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও বেশি। ১৯০৫ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ দেখা দিল পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজে। যুদ্ধজাহাজটি ছিল ওডেসার কাছে আর ওডেসা শহরে চলছিল সাধারণ ধর্মঘট। যুদ্ধ জাহাজের অত্যাচারী অফিসারদের উপর প্রতিশোধ নিল বিদ্রোহী নাবিকরা। জারের হুকুমে আরও কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ এল প্রথম জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকদের পরাস্ত করতে। কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করল অন্য যুদ্ধজাহাজের নাবিকরা। বিদ্রোহের লাল নিশান উড়তে লাগল পোটেমকিনের মাস্তুলে। ওডেসার ধর্মঘটী মজুর আর পোটেমকিনের বিদ্রোহী নাবিক আগুনের অক্ষরে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করল রুশ দেশের বিপ্লবে।

১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের ধাতু শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে তিন হাজার শ্রমিকের উপস্থিতিতে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন বলশেভিকরা। শ্রমিক শ্রেণি যে তাদেরই পক্ষে তার স্পষ্ট প্রমাণ যেমন পাওয়া গেল আবার লেনিনই যে রুশ দেশের শ্রমিকদের প্রকৃত নেতা তা উপলব্ধি করা গেল। ১৯১৪ সালের নভেম্বরে লেনিন লিখলেন 'প্রাভদার শিক্ষায় হাজার হাজার শ্রেণি সচেতন শ্রমিক বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব।' পরে লিখেছিলেন প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিক প্রাভদা কিনছেন, আরও অনেক বেশি সংখ্যক পড়ছেন।

"চেতনার গুরুত্বকে খাটো করলে শ্রমিকদেরই অপমান করা হয়। পার্টির কাছে তত্ত্বের গুরুত্বকে খাটো করলে সেই হাতিয়ারটিকে খাটো করা হবে যার সাহায্যে পার্টি বর্তমানকে বুঝেছে, ভবিষ্যৎকে দেখেছে। তাই লেনিন বলেলেন 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না। ... যে পার্টি সব থেকে অগ্রসর তত্ত্বের দ্বারা চালিত একমাত্র সেই পার্টি পারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে।'

যুদ্ধ, কারাবাস, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ইত্যাদি কারণে যদি এই সংখ্যার পাঁচগুণ এমনকি দশগুণ শ্রমিকও ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে শ্রমিকদের এই অংশটি কিছুতেই লোপ পেতে পারে না। এই অংশটি বেঁচে আছে। তাঁরা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাতিদম্ভের বিরোধী। একমাত্র তাঁরাই দাঁড়িয়ে আছেন জনগণের মধ্যে জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে। শোষিত নির্যাতিত ও শ্রমজীবীদের আন্তর্জাতিকতার পতাকা তাঁরাই উঁচুতে তুলে ধরেছেন। এই পতাকা তুলে ধরেই রুশ দেশের বলশেভিক সংগঠনগুলো মার্ক্সবাদকে বুকে বহন করে কমরেড লেনিনের শিক্ষায় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপুল বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অংশ নিল ধর্মঘটে। একের পর এক শ্রমিক ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হল। ১৯০৫-এর বিপ্লবে অর্জিত কারখানা শ্রমিকদের গণকমিটি বা সোভিয়েতের সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯১৭-র নভেম্বরে গড়ে উঠল শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত বা গণকমিটি। প্যারি কমিউনের বিপ্লবের শিক্ষাও তাদের সামনে ছিল।

সোভিয়েতগুলিই ছিল নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভ্রূণ। লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলো গড়ে তুলল গণঅভ্যুত্থান। ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের মহান দিশারী কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা আয়ত্ত করে মার্ক্সের শিক্ষার মূল নির্যাসকে উপলব্ধি করে সঠিকভাবে মার্ক্সবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে সফল হল দুনিয়ায় সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব। রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল সমাজতন্ত্র— শোষণহীন এক সমাজ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 12 Bengali Weekly November 1, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বাঙ্গালোর মেট্রো রেলে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে না এসইউসিআই(সি)-র

কর্ণাটকে বাঙ্গালোর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (বিএমআরসিএল) পরিচালিত 'নাম্মা মেট্রো'য় প্রতিদিন প্রায় ৭ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। এদের মধ্যে চাকুরে, ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়া দিনমজুররাও আছেন। সম্প্রতি ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করে যাত্রীদের মতামত চায় ওই সংস্থা। এস ইউ সি আই (সি)-র বাঙ্গালোর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, মেট্রোর ভাড়া বাড়ানো হলে তা ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর উপর অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে আসবে। ভাড়া বৃদ্ধির এই প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য দলের পক্ষ থেকে বিএমআরসিএল-এর কাছে স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

ভবানীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

গত ২৫ অক্টোবর কলকাতার ভবানীপুরে জল জমে থাকা রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান এক যুবক। ২৭ অক্টোবর, অল বেঙ্গল

ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি শিবাজী দে-র নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল মৃত যুবকের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। এর পর ভবানীপুর থানায় এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে অ্যাডিশনাল ওসির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তদন্ত চলছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই বিষয়ে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে সিইএসসি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার মেয়র-ইন-কাউন্সিল (লাইট অ্যান্ড ইলেকট্রিক) এবং এই এলাকার কাউন্সিলরকেও সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে নিহত যুবকের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে সমস্ত রকম সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে।

প্রকাশিত হয়েছে

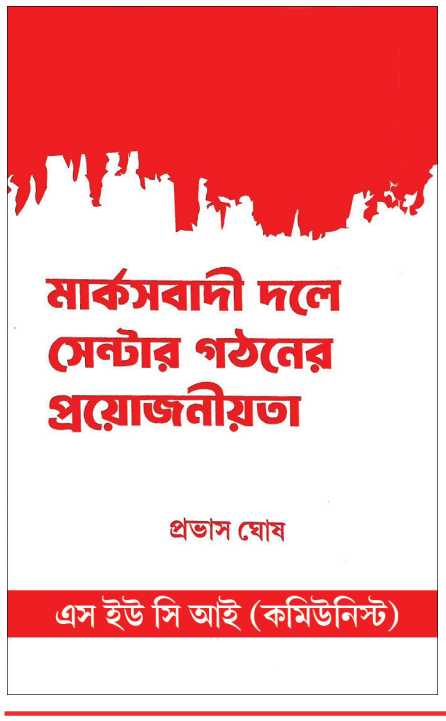

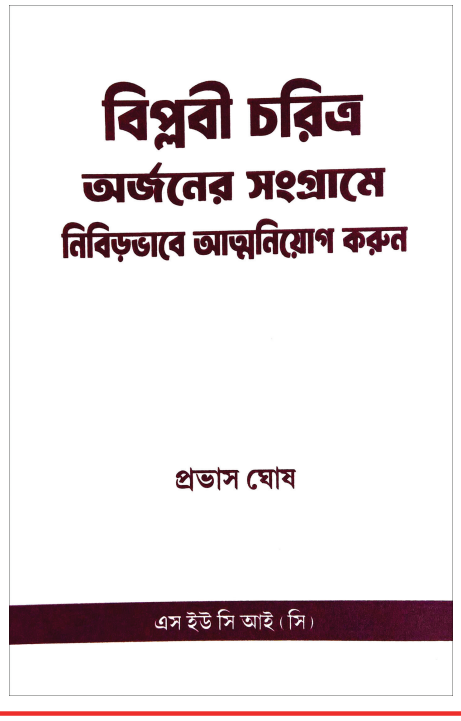

'অভয়া'র ন্যায়বিচারের দাবিতে

রায়গঞ্জে কনভেনশন

২৭ অক্টোবর সিটিজেনস ফর জাস্টিস, উত্তর দিনাজপুরের আহ্বানে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে। জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকি ও আইনি নোটিশ দিয়ে হয়রানির নিন্দা করে আর একটি প্রস্তাব এই কনভেনশনে গৃহীত হয়। চার শতাধিক বিভিন্ন পেশার নাগরিক এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে বক্তাদের আলোচনায় বার্তা উঠে আসে এই আন্দোলন কেবল শহরে নয়, গ্রামে-গঞ্জে নিয়ে যেতে হবে।

পক্ষে বক্তব্য রাখেন ডাঃ শাহরিয়ার আলম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রহটপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শাহিদুর রহমান, অধ্যাপক বরেন্দ্রনাথ গিরি, অধ্যাপক মানস জানা, মাধ্যমিক শিক্ষক মাহফুজ আলম, প্রসেনজিৎ সাহা, স্বাস্থ্যকর্মী মামুন আল রসিদ প্রমুখ। মূল প্রস্তাব পেশ করেন প্রদীপ কুমার সরকার। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো সহ অন্যদের উপর লাগাতার কনভেনশন শেষে প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক অমল মিত্রকে সভাপতি, প্রদীপ কুমার সরকারকে সম্পাদক, মামণি সন্ন্যাসী ও মামুন আল রসিদকে যুগ্ম সম্পাদক এবং মাধবী দত্তকে কোষাধ্যক্ষ করে সর্বসম্মতিক্রমে ২৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত, আগামী পক্ষকালের মধ্যে ব্লক স্তরে সিটিজেনস ফর জাস্টিস, উত্তর দিনাজপুরের শাখা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে

এ আই ডি এস ও-র

দশম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

২৭-২৯ নভেম্বর • দিল্লি

তালকাটোরা স্টেডিয়াম

উদ্বোধক ঃ ইরফান হাবিব, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ

প্রধান অতিথি ঃ অধ্যাপক চমনলাল, বিশিষ্ট লেখক

বিশেষ অতিথি ঃ অরুণ কুমার সিং, প্রাক্তন সভাপতি, এআইডিএসও

বক্তা ঃ ভি এন রাজশেখর, সভাপতি, এআইডিএসও

সভাপতি ঃ সৌরভ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এআইডিএসও

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তা ঃ প্রভাস ঘোষ

প্রথম সাধারণ সম্পাদক, এআইডিএসও, সাধারণ সম্পাদক এসইউসিআই(সি)

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com